# জাতীয়তাবাদের জট!

পশ্চিম ইউরোপে ক্ষমতাসীন ক্যাথলিক খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী প্রোটেস্টেন্টদের চলা দীর্ঘ ৩০ বছরের (১৬১৮-১৬৪৮) যুদ্ধের পর ওয়েস্টফিলিয়া নামক স্থানে শান্তিচুক্তি হয়।

শান্তিচুক্তির এই ঘটনাটি পরবর্তীতে দুনিয়ার ইতিহাসে এক রাজনৈতিক মাইলফলক হয়ে দাঁড়ায়। আর এই রাজনৈতিক মাইলফলকটি ছিল 'জাতিরাস্ট্র' এর ধারণার উদ্ভব।

আধুনিক এই জাতীয়তাবাদের ধারণা প্রথমবারের মতো সামনে আসে, খ্রিস্টানদের দুই উপদল প্রোটেস্টেন্ট ও ক্যাথলিকদের ৩০ বছর মেয়াদী এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পরই।

দীর্ঘ যুদ্ধের পর মীমাংসার উদ্দেশ্যে ইউরোপের খ্রিস্টান রোমান সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ সীমানা অংকন করে বিভাজন করা হয়। অতঃপর, নতুন নাম দিয়ে বিভিন্ন নগররাস্ট্র হিসেবে বন্টন করা হয়।

পরবর্তীতে বিশ্বব্যাপী ইউরোপিয় উপনিবেশবাদ কায়েম হওয়ায় সর্বত্রই এচিন্তাধারা ব্যাপকতা লাভ করে এবং জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করে!

'জাতিরাস্ট্র' হচ্ছে শুরুতে সীমানা একে দেয়া ভুমির নামকরণ করে রাস্ট্র ঘোষণা করা। অতঃপর উক্ত রাস্ট্রের পরিচয়ে সেই ভুমির নামে অধিবাসীদের চিহ্নিত করা!

সহজে বললে, জাতির পরিচয় হবে সীমানা-নির্ধারিত রাস্ট্রের পরিচয়ে। মূল্যবোধ নির্ধারিত হবে রাস্ট্রের আইনের ভিত্তিতে। ঐক্য, শত্রুতা-মিত্রতা, প্রিভিলিজ/সুবিধা ভোগ সবই হবে রাস্ট্রীয় পরিচয়ে।

অর্থাৎ, যার কোনো রাস্ট্র নাই, তার কোনো পরিচয়ও নাই। ধর্মীয় পরিচয়, গোত্রীয় পরিচয় কোনো কিছুরই গুরুত্ব বা স্বীকৃতি নেই!

প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন। 'আধুনিক' জাতিরাষ্ট্র ধারণা যদি এতই নতুন হয়, তবে ইতিপূর্বে কি ছিল!?

'জাতিরাষ্ট্র' এর পূর্বে প্রি-মডার্ন যুগে হাজার হাজার বছর শাসনকাঠামোগুলো (Government) পরিচিত ছিল সাম্রাজ্য (Empire), দেশ (Country), ইমারা/দাওলা (State), খিলাফাহ ইত্যাদি নামে। মানুষের পরিচয়, ঐক্য, লেনদেনের কম্পাস কাজ করতো দ্বীন, ধর্ম বা সুনির্দিষ্ট রাজ্যের রাজার আনুগত্যের ভিত্তিতে।

মানুষ নিজের বাসস্থান বা থাকার জায়গাকে আদর্শিক রূপদানের মতো ফিতরাতবিরোধী, অমানবিক, বর্বর ও সাম্প্রদায়িক অন্ধত্বের মানসিকতা থেকে ছিল মুক্ত।

কেননা, শুধুমাত্র আমেরিকা বা বাংলাদেশে জন্ম নেয়ার কারণেই আমি হাইতি বা বতসোয়ানার মানুষের চেয়ে অধিক সম্মানের অধিকারী; এমন চিন্তা কেবল অসুস্থ মস্তিষ্কেই স্থান পেতে পারতো! এমনকি চরম গোত্রীয় জাতিয়তাবাদও এতটা অসার ছিল না।

উল্লেখ্য, আধুনিক সময়ের সীমানা একে রাষ্ট্র গঠন এবং এর ভিত্তিতে শাসনব্যাবস্থা নিয়ন্ত্রিত, পরিচালিত হওয়াকে হয়তো অনিবার্য ও সাময়িক বাস্তবতা হিসেবে মেনে নেয়া যেতে পারে। কিন্তু কোনোভাবেই অতি-অন্ধকার যুগের গোত্রীয় জাতিয়তাবাদের ন্যায় রাষ্ট্রীয় জাতিয়তাবাদের ধারণাকে মেনে নেয়া সম্ভব না।

একজন ব্যাক্তি হয়তো সীমানাবদ্ধ রাষ্ট্রের ভিত্তিতে ব্যাবস্থাপনাগত ও দুনিয়াবি বিষয় সমাধান করতে পারে, নিজেদের মাঝে লেনদেনের কাঠামো ঠিক করতে পারে, নিজেকে উক্ত রাষ্ট্রের অধিবাসী হিসেবে বাংলাদেশী, লিবিয়ান পরিচয় দিতে পারে; কিন্তু, রাষ্ট্রের পরিচয়কে নিজ আদর্শের বিপরীতে বা উপরে স্থান দেয়া নিতান্তই অমানবিক, নিচু মানসিকতা ও অবশ্যই তাওহিদবিরোধী আকিদা।

বাংলাদেশী পরিচয় কখনই মুসলিম পরিচয়কে সুপারসিড করতে পারেনা। ভারতীয় মুসলিমের তুলনায় বাংলাদেশী হিন্দু অধিক প্রিয়ভাজন হতে পারেনা।

নির্দিষ্ট বংশ বা বর্ণের হওয়ার ফলে সুপ্রিমেসি দাবী করা যদি মানবতাবিরোধী হতে পারে, তাহলে সুনির্দিষ্ট রাষ্ট্রে জন্ম নেয়াকে সুপ্রিমেসির মানদন্ড বানানোও একই

রকম মানবতাবিরোধী হওয়ার কথা। কিন্তু, মডার্নিটির বাতিল চিন্তাকাঠামোর অন্ধানুসারী তা চিহ্নিত করতে অক্ষম।

তাই তো, ইউরোপে খ্রিস্টীয় শাসনের কঠিনতম পর্যায়েও, মানুষের নীতিনৈতিকতাবোধ, সামাজিক মূল্যবোধ 'আধুনিক জাতিরাষ্ট্র'এর অধিবাসীদের চেয়ে উন্নত ছিল। কারণ, হালের অন্ধ জাতীয়তাবাদের চেয়েও বিকৃত খ্রিস্টবাদ ছিল বহুগুণ মানবিক।

ইসলামী শাসনের সাথে 'আধুনিক' অসভ্য 'জাতিরাষ্ট্রের তুলনা করা ইসলামেরই অবমাননা হতে পারে বিবেচনায় সেদিকে আর গেলাম না।

তবে,

ওয়েস্টফিলিয়ার চুক্তির সময় অটোনমি পাওয়া নতুন রাষ্ট্রগুলো থেকে 'জাতিরাষ্ট্র' ধারণার সাধারণ একটি কাঠামো পাওয়া গেলেও, তা আজকের জাতিরাষ্ট্রগুলোর মতো ছিল না।

এছাড়া রাষ্ট্রগুলো ছিল রাজতান্ত্রিক থিওক্রেটিক রাষ্ট্র। বিপরীতে বর্তমানে রাজতান্ত্রিক শাসন রয়েছে অল্প কিছু রাষ্ট্রে। অধিকাংশ (এখনের হিসাব মোতাবেক ১৫৯টি) রাষ্ট্রই রিপাবলিক হিসেবে চিহ্নিত।

উল্লেখ্য, প্রজাতন্ত্র বা রিপাবলিক হচ্ছে, রাষ্ট্রক্ষমতা, শাসন ও আইনের মূল উৎস ধরা হয় রাষ্ট্রের জনগণের সমর্থনকে। যা সাধারণত গণতন্ত্র বা জনসমর্থিত স্বৈরশাসনের মাধ্যমে অর্জিত হয়।

প্রজাতন্ত্রের বিপরীত ধরা হয় রাজতন্ত্রকে; যেখানে রাষ্ট্রক্ষমতা, শাসন ও আইনের মূল উৎস ধরা হয় ইসলামী শরিয়াহ কিংবা অন্য কোনো ধর্ম, ঐতিহ্য বা খোদ রাজাকে। যা সাধারণত ইসলাম বা ধর্মীয় নীতির আনুগত্য কিংবা ভুতপূর্ব রাজার অনুমোদনের মাধ্যমে অর্জিত হয়ে থাকে।

(অতএব, যারা ইসলামী রিপাবলিকের স্বপ্নে বিভোর তাদের একটু পুনর্চিন্তা প্রয়োজন সম্ভবত।)

মূলত,

নব্যধর্ম মডার্নিটির অন্যতম রুকন 'জাতিরাস্ট্র' বা 'জাতিয়াতাবাদ' (Nationalism) দর্শনের আদর্শিক উদাহারণ হিসেবে, দুনিয়ার বুকে প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করে ফ্রান্স। ১৭৮৯ সালের পর। কুখ্যাত ফরাসি বিপ্লব তথা সন্ত্রাসের রাজত্বের পর। গিলোটিন, খন্ডিত মস্তক আর কানায় কানায় পূর্ণ বাস্তিলের কারাগারের বদৌলতে।

ফ্রান্সই হচ্ছে পৃথিবীর প্রথম "রিপাবলিকান নেশন স্টেট" বা "প্রজাতান্ত্রিক জাতিরাস্ট্র"।

অতঃপর আসলো নেপোলিয়নের মহাদেশীয় যুদ্ধ। অবিশ্বাস্য সামরিক উত্থানের ফলে গোটা ইউরোপে মডার্নিটির বীজ ছড়িয়ে পড়তে লাগলো কল্পনার চেয়েও দ্রুতগতিতে। ভেনিস, জেনোয়া, ডাচ। রাজতন্ত্র উচ্ছেদ হলো। কায়েম হলো রিপাবলিক! আরো ভালো করে বললে রিপাবলিকান জাতিরাষ্ট্র। যে সকল রাস্ট্র কেবল জাগতিক বুদ্ধির আলোকে হবে পরিচালিত। প্রাচীন আইন, সংস্কৃতি যতই কল্যাণকর হোক না কেন, 'আধুনিক' না হওয়ার 'অপরাধে' তাদের অবস্থান হবে ট্র্যাশক্যানে।

বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে, বিশেষত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর "রিপাবলিকান জাতিরাষ্ট্র" ধারণা দুনিয়াব্যাপী ব্যাপকতা লাভ করে। এছাড়াও, ইউরোপীয় শক্তিগুলো এশিয়া ও আফ্রিকায় উপনিবেশিত  রাজতান্ত্রিক সাম্রাজ্যগুলোকে ডি-কলোনাইজেশনের নামে "রিপাবলিকান নেশন স্টেট" বা "প্রজাতান্ত্রিক জাতিরাষ্ট্র"তে রূপান্তরিত করেই নিজ ভূমে ফেরত আসে।

আর, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ী শক্তি (বিশেষত, আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়ন) পরবর্তী সময়ে জাতিসংঘের মাধ্যমে গোটা দুনিয়াকে নিজেদের করায়ত্ত করতে আগ্রহী হয়। ফলত, প্রজাতন্ত্রগুলো তো বটেই, অল্প যে কয়টি রাজতান্ত্রিক শাসন বাকি থাকে, তারাও জাতিরাষ্ট্র কাঠামোকে গ্রহণ করে নেয়।

উল্লেখ্য,

আর বিশ্বব্যাপী জাতিয়তাবাদের এই নতুন ধর্মের সুরক্ষা ও প্রসারে শত কোটির উপর মানুষ হয়েছে নিহত। সংঘটিত হয়েছে দুটি বিশ্বযুদ্ধ, চল্লিশ বছর চলেছে শীতল যুদ্ধ। পারমাণবিক বোমায় একদিনে নিহত হয়েছে কয়েক লক্ষাধিক। অব্যবহিত সময় পরপর হয়েছে, হচ্ছে গণহত্যা। আর রাষ্ট্রোদ্রোহিতার নামে খ্রিস্টীয় ইনকুইজিশনের আদলে হত্যা, বন্দী আর নির্বাসন হয়েছে, হচ্ছে কত শত কোটি মানুষ, তার কোনো ইয়ত্তা নেই। নেই কোনো পরিসংখ্যান।

'আধুনিকতা'র ফেরিওয়ালারা দিনরাত ধর্মীয় সহিংসতার সমালোচনায় জীবন-যৌবন বিলিয়ে দেয়। অথচ, মডার্নিটির উপহার নব্য জাহেলিয়াত "উগ্র জাতীয়তাবাদ" এর ফলে কয়েক সহস্রগুণ সহিংসতা ও মানবিক বিপর্যয় দেখেও তারা ইচ্ছা-অন্ধত্বের পথ বেছে নেয়। আল্লাহ তা আলা এসকল জাহেলে মুরাক্কাব, আদর্শিক জারজদের ধ্বংস করুন।

উপমহাদেশে ব্রিটিশরা তাদের দেশীয় উত্তরাধিকার জাতিয়তাবাদী সেক্যুলার নেতা জিন্নাহ ও নেহরুদের হাতেই ক্ষমতা হস্তান্তর করে যায়, যেন ইসলামী উপমহাদেশের প্রত্যাবর্তন বিলম্বিত বা স্থগিত হয়ে যায়! যে ইসলামী শাসন কয়েকশ বছর ইনসাফের সাথে উপমহাদেশকে সুস্থির রেখেছিল।

একইভাবে পরবর্তীতে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের পতাকায় পূর্ব বাংলার মানচিত্রের উপস্থিতি, আর রেহমান সোবহানের নামকরণ অস্তিত্বে আসার পূর্বেই ঘোষণা করে দিয়েছিল " বাংলাদেশ" নামক জাতিয়তাবাদী রাষ্ট্রের।

পশ্চিমা আধিপত্যাধীন দুনিয়ার অনুকরণে এভাবেই আমাদের ভূমিতেও পূর্ণতা লাভ করে 'জাতিরাষ্ট্র' বা 'আধুনিক' জাতীয়তাবাদ নামক নয়া রাজনৈতিক দর্শন; যা সুস্পষ্টই তাওহিদের আকিদার সাথে সাংঘর্ষিক।

গোত্রীয় বা বর্ণবাদী জাতিয়তাবাদি প্রথায় কেবল সুনির্দিষ্ট কোনো গোত্র বা বর্ণের অনুসারী হওয়াই অন্য গোত্রের চেয়ে বিশেষ সাব্যস্ত করা হতো, চাই গোত্রের অনুসারী যা ই হোক না কেন। আধুনিক জাতিয়তাবাদে গোত্রের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে রাষ্ট্র। এখন, বংশ বা বর্ণের পরিবর্তে জন্মভূমির মাধ্যমে অর্জন হয় শ্রেষ্ঠত্ব; যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে কোনো যোগ্যতা লাগেনা।

ইসলাম তো বটেই, স্বাভাবিক মূল্যবোধের দাবীও এটাই যে,

রাস্ট্র কখনো ভালোবাসা-শত্রুতা, ন্যায়-অন্যায় নির্ধারণের মানদণ্ড হতে পারেনা। নিজ ইচ্ছার বাইরে নির্দিস্ট কোনো ভুখণ্ডে জন্ম নেয়ার ফলেই এক মানুষ অন্য মানুষ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে উন্নত হয়ে যায় না।

বরং, প্রকৃত জাতীয়তা নির্ধারণ করা হবে ইসলামী শরিয়াহর ভিত্তিতে। উত্তম-অনুত্তম কেবল ইসলামের বিচারেই নির্ধারিত হতে পারে। কেননা, এ উৎকর্ষতা অর্জনের সুযোগ প্রত্যেক রাস্ট্রের অধিবাসীর জন্যই উন্মুক্ত!

আল্লাহ তা আলা বলেন,

هُوَ الَّذِىۡ خَلَقَكُمۡ فَمِنۡكُمۡ كَافِرٌ وَّ مِنۡكُمۡ مُّؤۡمِنٌ

"তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ হয় কাফির এবং কেউ হয় মুমিন।"

(২)

এদেশের ইতিহাসে পটপরিবর্তনকারী সবচেয়ে বড় ঘটনা হিসেবে দেখা হয়- আওয়ামি লীগের নের্তৃত্বে পরিচালিত বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে সংঘটিত ১৯৭১ এর যুদ্ধকে।

পাকিস্তানের সেনাশাসিত সরকারের অর্থনৈতিক অসম বন্টনের জের ধরে শেখ মুজিব ও তার সঙ্গীসাথীদের প্রচার-প্রোপাগান্ডায় পুর্ব বাংলায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তীব্রতা লাভ করে।

শেখ মুজিবুর রহমান একাধারে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র উভয়ের কথা কমবেশী বললেও, প্রকৃত অর্থে তিনি ছিল একজন জাতীয়তাবাদী নেতা।

এর প্রমাণ পাওয়া যায়, তার অনুসারীদের মাঝে খন্দকার মুশতাক, শেখ মনির মতো বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক এবং তাজউদ্দিন, সিরাজুল আলম খানের মতো আল্ট্রা-বামপন্থীদের সন্নিবেশ ঘটার মাঝে।

উপনিবেশবিরোধী সেক্যুলার জাতিয়তাবাদী নেতারাই (যেমন- কেনিয়ার জোমো কেনিয়াত্তা, আলজেরিয়ার আহমেদ বেনবেল্লা, ইন্দোনেশিয়ার আহমদ সুকর্ন বা তিউনিশিয়ার হাবিব বুরগিবা প্রমুখ) ছিল এক্ষেত্রে তার আদর্শ।

লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ আবার আসলে কেবল শুধু বাংগালী ভাষাকেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদ নয়, বরং র‍্যাডক্লিফ লাইনের পূর্ব পাশে থাকা পাকিস্তান অংশের ভুমিকেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদ; তথা জাতিরাষ্ট্র ধারণার আলোকে প্রস্তাবিত জাতিয়তাবাদ। অন্যথায় পার্বত্য চট্টগ্রামের অবাংগালীরা কেন পূর্ব বাংলার অন্তর্ভুক্ত হলো!? আর কেনই বা তারা স্বাধীনতা চাইলে দমনের শিকার হচ্ছে!? কেননা, রাজনৈতিক নিরাপত্তার চেয়ে রাষ্ট্রের আকার অতিক্ষুদ্র না হওয়া জরুরী।

অর্থাৎ, বাংলাদেশের রাজনীতির চিন্তাধারার কেন্দ্রে রয়েছে, জাতিসংঘ নিয়ন্ত্রিত নব্য বিশ্বব্যাবস্থার আলোকে সীমানা ও ভুমির আলোকে নির্ধারিত ভুমিকেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদ।

এহেতু, শেখ মুজিবের আওয়ামীলীগের মানহাজ ছিল, পূর্ব বাংলার জাতিয়তাবাদী উন্মেষকে কাজে লাগিয়ে পূর্ব বাংলা শাসন করা।

শেখ মুজিবর রহমানের আন্দোলন ও রাজনীতির মূল লাইন ছিল 'বাংগালী জাতীয়তাবাদ'। অর্থাৎ, পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাংগালি পরিচয়কে প্রিভিলিজ দেয়া। আর ২৫শে মার্চ রাতে শুধুমাত্র বাংগালী পরিচয়ের কারণে পাকিস্তানি জান্তার ব্যাপক হতে গণহত্যার ফলে বাংগালী জাতিয়তাবাদের স্ফুলিঙ্গ বিস্ফোরণে পরিণত হয়!

এজন্যই তাকে ১৯৬৬ সালে প্রথমে ফেডারেল সরকারের অধীনে অধিকতর স্বায়ত্তশাসন চাইতে দেখা যায়। অতঃপর ১৯৭০ এ কনফেডারেশন চাইতে দেখা যায়। এবং সবশেষে আলাদা রাষ্ট্রের অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে দেখা যায়।

বিষয়টা এমন নয় যে, শেখ মুজিব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে চাননি। আবার এমনও নয় যে, তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা চাননি। বরং পরিস্থিতির দাবী অনুযায়ী উদ্দেশ্য তিনি পরিবর্তন করেছেন।

বাস্তবতা হচ্ছে, তোষামোদকারী ও শত্রুভাবাপন্ন উভয় ধাচের ইতিহাসবিদের পক্ষপাতদুষ্ট আলোচনা ও লেখা এক্ষেত্রে আমাদের প্রান্তিক উপলব্ধির দিকে নিয়ে গিয়েছে।

বাংগালী জাতিয়তাবাদের চেতনা পূর্ব বাংলার মানুষের অন্তরে প্রবেশ করাতে রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকেই, শেখ মুজিব ও তার অনুসারীরা পাকিস্তানকে নব্য উপনিবেশবাদ বলে আখ্যায়িত করতো।

মূলত অর্থনৈতিক শোষন বা বঞ্চনার স্লোগান ছিল কেবল সাধারণ জনগণের আবেগের স্ফুরণ ঘটানোর উদ্দেশ্যে।

পূর্ব বাংলাকে আলাদা জাতিরাষ্ট্র করার পেছনে মূল নিয়ামক হিসেবে শেখ মুজিব ও আওয়ামি লীগ অর্থনৈতিক শোষনকে সামনে রেখেই সবসময় আন্দোলন করে আসে।

মূলতঃ শেখ মুজিবের ফোকাস ছিল বাংলাভাষী জনতাকে উত্তেজিত করে রাস্ট্রের প্রধান হওয়া। আর যেহেতু সোভিয়েত ও ভারতের সাহায্য ছাড়া নতুন রাস্ট্রের অস্তিত্ব দান কিংবা স্থায়ীত্ব অর্জন সম্ভব না তাই সেকুলারিজম ও সমাজতন্ত্রের দিকে ঝোঁকা ছাড়া তার বিকল্প ছিল না।

অর্থনৈতিক বৈষম্য ফুটিয়ে তুলতে "সোনার বাংলা শ্মশান কেন" শীর্ষক স্লোগান ও পোস্টার গোটা পূর্ব বাংলা চরম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

নুরুল ইসলাম ও হাশেম খানের প্রচেষ্টায় চিত্রিত এই পোস্টারে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতার তুলনামূলক চিত্র পোস্টারে তুলে ধরা হয়। ৭০ এর নির্বাচনে আওয়ামিলীগের ল্যান্ডস্লাইড বিজয়ের অন্যতম নিয়ামক ধরা হয় এই পোস্টারটিকে।

আসলে, অর্থনৈতিক বৈষম্য নয়, বরং পূর্ব বাংলায় একচ্ছত্র আওয়ামী নের্তৃত্ব কায়েমই ছিল পাকিস্তানবিরোধী আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য। তা কনফেডারেশনের আদলেই আসুক, আর আলাদা রাস্ট্রের আকারেই আসুক।

অর্থনৈতিক উন্নতি যে প্রকৃত অর্থে আলাদা রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ছিলনা, তার প্রমাণ মেলে '৭১ পরবর্তী বাস্তবতা ও পরিসংখ্যানেঃ-

বাংগালী অধ্যুষিত পূর্ব বাংলা আলাদা হয়ে বাংলাদেশে পরিণত হয় ১৯৭১ এর শেষদিকে। ১৯৭২ এর জানুয়ারিতেই বাংলাদেশে আওয়ামী শাসন কায়েমের পর, মুজিব সরকার যুদ্ধপরবর্তী পরিস্থিতি কাটিয়ে ওঠার জন্য শুধুমাত্র বৈদেশিক সাহায্যই পায় তৎকালীন সময়ের আড়াই হাজার কোটি মার্কিন ডলার! তথাপি,

'৭১ এর পর থেকেই নিত্য ব্যবহার্য প্রয়াজেনীয় পণ্য সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি পেতে থাকে।

শিল্প-কারখানা ও কৃষি ক্ষেত্রের উৎপাদন স্বাধীনতার পূর্বেকার (১৯৬৯-৭০) পর্যায়ে উত্তরণ করা সম্ভব হয়নি। মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (জিডিপি) ১৯৭২-৭৩ সালে এসে ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের শেষ স্বাভাবিক বছরের (১৯৬৯-৭০) তুলনায় প্রকৃত অর্থে ১২-১৪% ভাগ কমে যায়।

অনুরূপভাবে, মাথাপিছু জিডিপি ১৯৭২-৭৩ সালে ১৯৬৯-৭০ সালের চেয়ে একপঞ্চমাংশ কম ছিল।

দেশের মানুষের প্রধান খাদ্য ধানের উৎপাদন ১৯৭২-৭৩ সালে ১৯৬৯-৭০ সালের তুলনায় ১৫% ভাগ কম ছিল।

১৯৬৯-৭০ সালের তুলনায় শিল্প উৎপাদন ১৯৭২-৭৩ সালে প্রায় ৩০% ভাগ হ্রাস পায়।

১৯৬৯-৭০ সালের সামগ্রিক শিল্প-উৎপাদনের নিরিখে ১৯৭২-৭৩ সালে অবনতিশীল পরিস্থিতিতে দেখা যায়।

পাট শিল্পে উৎপাদন শতকরা ২৮ ভাগ, বস্ত্র শিল্পের ক্ষেত্রে সুতা উৎপাদন ২৩% ভাগ ও কাপড়ে ৩% ভাগ কম ছিল। এবং চিনি উৎপাদন হয়েছিল মাত্র পঞ্চমাংশ।

১৯৭২-৭৩ সালে দেশের রফতানী ১৯৬৯-৭০ সালের তুলনায় প্রায় শতকরা ৩০ ভাগ কমে গিয়েছিল।

শেখ মুজিবের শাসনাধীন বাংলাদেশের সূচনা-পর্বে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চরম হতাশাজনক পরিস্থিতির পেছনে যে আসলে কেবল যুদ্ধোত্তর অর্থনীতি দায়ী করা যায়না। বরং,

প্রথমত, মুজিব সরকারের রাষ্ট্রীয়করণ নীতির কারণে সকল বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ ও মালিকানা সরাসরি রাষ্ট্রের কর্তৃত্বে চলে আসে।

কিন্তু রাষ্ট্র এসবের যথাযথ ব্যবস্থাপনা করতে পারেনি। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, কোন ব্যবস্থাপনা জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও যাগ্যেতা না থাকার পরেও- আওয়ামী লীগের উঁচু মহলে ভালা সম্পর্ক ও যাগোযাগে থাকার কারণে একদল লাকে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ পদে নিয়োগ লাভ করে।

এ সকল লাকেজন সরকার দলের পৃষ্ঠপাষেকতায় শিল্পাঞ্চল দখল করে সম্ভাব্য সকল উপায়ে পদ-পদবীর জোরে নিজেদের ভবিষ্যত অর্থনৈতিক ভাগ্য গড়ে তুলতে চূড়ান্ত প্রচেষ্টা চালায়।

অযাগ্যে প্রশাসনের সঙ্গে খুচরা যন্ত্রাংশের অপর্যাপ্ততা, কাঁচামালের অভাব ও ব্যাপক শ্রমিক অসন্তোষ রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে উৎপাদনের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যে মাত্রায় হ্রাস করে।

দ্বিতীয়ত, দেশের নাজুক অর্থনৈতিক সম্পদের এক বড়া অংশ মুনাফালাভী ব্যবসায়ীরা ভারতে পাচার করতে থাকে। দেশের প্রধান রফতানী আয়ের উৎস পাট এবং খাদ্যশস্য পাচার করা একটি প্রাতিষ্ঠানিক বাণিজ্যে পরিণত হয়।

চোরাচালান নির্ভর এসব অবৈধ ব্যবসা বন্ধের জন্য মুজিব সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে পড়ে।

১৯৭৩-৭৪ অর্থবছরে পনের লক্ষ টন ধান ও আট লক্ষ টন চাল ভারতে পাচার হয়ে যায়। চোরাচালানের ফলে দেশের বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনে ব্যাপক অবনতি ঘটে এবং খাদ্য ঘাটতি দেখা যায়।

এসব কারণ ছাড়াও, অপর্যাপ্ত মুদ্রা সরবরাহ ও অর্থের ঘাটতি দেশের দুর্বল অর্থনৈতিক অবস্থার পেছনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে।

১৯৭৩-৭৪ সালের বার্ষিক পরিকল্পনা রিপোর্টে বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন স্বীকার করে যে :

"দেশের কঠিন অর্থনৈতিক পরিস্থিতি জনগণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত করছে। বিশেষভাবে ভূমিহীন গ্রামীণ শ্রমজীবী এবং ব্যাপকভাবে শহুরে জনগণ এই পরিস্থিতির শিকার।

নিত্য ব্যবহার্য মৌলিক সামগ্রীর অপর্যাপ্ততা ও উচ্চমূল্য সামগ্রিক সামাজিক ও রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়িয়ে দিয়েছে।"

অর্থাৎ, পূর্ব বাংলার জনগণের উপর আওয়ামিলীগ সরকারের শোষন ও নিপীড়ন আইয়ুব খান বা ইয়াহিয়া খানের শাসনামলের চেয়েও বহুগুণ বেশী ছিল।

এছাড়াও, জাতীয়তাবাদি আন্দোলনের প্রাক্কালে, অর্থনৈতিক মুক্তির পাশাপাশি শেখ মুজিবের আওয়ামি লীগ আওড়াতে থাকে- গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা, পূর্ব বাংলার জনসাধারণের জানমালের হেফাজত কিংবা বাকস্বাধীনতা রক্ষার মতো বিষয়াবলী।

অতঃপর, '৭১ পূর্ব ও পরবর্তী বাস্তবতা সামনে রাখলে আমরা দেখি-

ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নাল, বিবিসি, আমেরিকা স্টেট ডিপার্টমেন্ট ও অন্যান্য স্বাধীন সংস্থার জরিপ অনুযায়ী ১৯৭১ এ গণহত্যায় নিহতদের সংখ্যা ২,৬৯,০০০ থেকে ৩ লাখ দেখানো হয়েছে।

বিপরীতে, আওয়ামী লীগ সরকারের হাতে বাংগালী বামপন্থীই কেবল নিহত হয়েছে ৬০০০০ এর অধিক। এর বাইরে রক্ষীবাহিনীর হাতে বিচারবহির্ভূত অন্যান্য হত্যাযজ্ঞ তো আছেই।

অর্থাৎ, এভুমির মানুষের উপর শেখ মুজিবের আওয়ামীলীগ পাক ফৌজিদের তুলনায় অনেক বেশী পরিমাণে জুলুম-নিপীড়ন চালিয়েছিল।

বাকস্বাধীনতা বা রাজনীতি চর্চার ক্ষেত্রে আওয়ামীলীগের দমননীতি এই ছিল যে, গুটিকয়েক পত্রিকা ব্যাতীত সব নিষিদ্ধকরণ এবং পূর্বের ছয়টি রাজনৈতিক দল এবং ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা।

গণতন্ত্রের কথা যদি বলা হয় তবে দেখা যায় যে, সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে বাকশাল গঠন করে শেখ মুজিব ওয়ান পার্টি শাসন প্রতিষ্ঠা করে সাংবিধানিকভাবেই গণতন্ত্রকে স্থায়ী বিদায় জানায়। যাকে শেখ মুজিব আখ্যায়িত করেছিল তার "২য় বিপ্লব" নামে।

উপরোক্ত আলোচনার উদ্দেশ্য আওয়ামিলীগের সমালোচনা বা পাকিস্তানের প্রশংসা নয়। বরং, এবিষয়টির বাস্তবতা উপলব্ধি করা যে,

স্রেফ পাকিস্তানিদের দ্বারা হত্যা-নির্যাতন, গণতন্ত্র বা বাকস্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপের ফলে ১৯৭১ এর বিপ্লব সংঘটিত, সফল হয়নি। বরং এগুলো শেখ মুজিবের মূল প্রোগ্রামকে শক্তিশালীকারী প্রভাবক ছিলা।কেবল। শেখ মুজিবের মূল মানহাজ ছিল "বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ" ।

তীব্র জাতিয়তাবাদী আবেগ জনমানসে জায়গা করার ফলে পরবর্তী রাজনৈতিক দলগুলোও বাংগালী বা বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদকে আকড়ে ধরেই কর্মসূচী ও ডিসকোর্স দাড় করায়। আর এক্ষেত্রে অগ্রগামী ভূমিকা রাখে জিয়াউর রহমান ও তার দল বিএনপি। যারা "বাংগালী জাতিয়তাবাদ" এর পরিবর্তে "বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ" এর প্রবর্তন করে, পরিভাষাগত জটিলতা দূর করার চেষ্টা করে।

যার ফলে বাস্তবতা এটাই যে, যা ঘটার না তা ঘটে গেছে। যা হওয়ার না তা হয়ে গেছে।

তীব্র জাতিয়তাবাদী আন্দোলনের জঠর থেকে জন্ম নেয়া এবং দীর্ঘদিন যাবৎ পরিচর্যা হওয়ায়, এদেশে জাতিয়তাবাদী চিন্তা মানুষের মস্তিষ্কে এমনভাবে জেঁকে বসেছে যে, মানুষ একাঠামোর অতীতকালের বাস্তবতা মনে করতে পারেনা, ভবিষ্যতও কল্পনা করতে পারেনা।

ইতিহাস আমাদের বলে,

অর্থনীতি, গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্র ইত্যাদি নয় বরং একটি জাতি সাধারণত নিজের অধিকার ফিরে পেতে চায়, এই মূলনীতিটি সামনে রেখেই সাধারণত পরিবর্তনের ঝড়ের সূচনা ঘটে।

ইতিহাসে দেখা যায়, জাতিরাষ্ট্রের ধারণা ব্যাপক হওয়ার পূর্বে বিভিন্ন গোত্র বা বর্ণ অথবা ধর্মই ব্যাপকভাবে মানুষকে পরিবর্তনের সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ করেছে।

সাম্প্রতিক ইতিহাসে বিশ্বব্যাপী শেখ মুজিবসহ আধুনিক সেকুল্যার নেতারা ধর্মের পরিবর্তে জাতিয়তাবাদকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং ধর্মকে ঐক্য ও মূল্যবোধের মূল ভিত্তি না করে ব্যাক্তিগত অভিরুচির অংশ করে দিয়েছে।

আধুনিক জাতিয়তাবাদীরা ধর্মকে পুরোপুরি মুছে ফেলেনি। কারণ এমনটা হলে প্রতিরোধের আগুন ঠেকানোর ক্ষমতা জাতীয়তাবাদি স্লোগানের নাও থাকতে পারতো। এহেতু, তারা কেবল ধর্মকে আদর্শের সিরিয়ালে নিচের দিকে নামিয়ে দিয়েছে।

আমরা সুনিশ্চিত যে, ইসলাম অবশ্যই জাতিয়তাবাদ অপেক্ষা শক্তিশালী আদর্শ! কিন্তু ইসলামের নের্তৃত্বকে জাতিয়তাবাদ দ্বারা প্রতিস্থাপন করা সম্ভব হলো কিভাবে!!?

এর কারণ- ইসলামী সচেতনতাবোধের সংকট। বাস্তব অবস্থার বিশ্লেষণে ইসলামের শরণাপন্ন না হয়ে, পশ্চিমা জাতীয়তাবাদী চিন্তা ও কাঠামোর আশ্রয় নেয়া।

অথচ,

হাল জমানায় পশ্চিমা শত্রুপক্ষ ও স্থানীয় দালাল সেকুল্যারদের অন্যতম ক্রিয়াশীল আদর্শিক অস্ত্র হচ্ছে,

মডার্নিটির গর্ভ থেকে জন্ম নেয়া জাতিরাষ্ট্রকেন্দ্রিক “আধুনিক জাতিয়তাবাদ” ।

এই ভয়াবহ বাস্তবতা থেকে উত্তরণে যদি 'বাংলাদেশ' নামক জাতিরাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমানাকে অস্বীকার না করে, অনিবার্য ও সাময়িক বাস্তবতা হিসেবে মেনে নেয়াও হয়, তবুও-

আপামর জনসাধারণের তাওহিদ ও ঈমানের সুরক্ষায় "জাতিয়তাবাদ" নামক চলমান কুফরি চিন্তাধারা মুসলিম মানস থেকে উৎখাত করা ইসলামপন্থীদের অপরিহার্য দায়িত্ব।

এছাড়াও, এও বুঝে নেয়া দরকার যে,

জাতিয়তাবাদিদের আনুগত্য বা এ মানসিকতায় আচ্ছন্ন হয়ে ইসলামপন্থার উত্তরণ আদৌ সম্ভব নয়; কেননা, শত্রুর আদর্শ গ্রহণ করে বিজয়ী হওয়া সম্ভব নয়।